প্রি-সাবমিশন সেমিনারের জন্য প্রদত্ত আনুমানিক ৫০০০ শব্দের সারসংক্ষেপ

: গবেষণা প্রকল্পের বিষয় :

জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস : সময় ও ব্যক্তিমন

গবেষক

সৌমিক ঘোষ

জুনিয়র রিসার্চ ফেলো (ইউজিসি-নেট)

বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

৮৬/১, কলেজ স্ট্রিট কলকাতা- ৭০০০৭৩

ই মেল- soumikpresi06@gmail.com

চলভাষ- +৯১ ৭০০৩৬২৭৫৭৩

গবেষণা- তত্ত্বাবধায়ক

ডক্টর শাওন নন্দী

সহকারী অধ্যাপক

বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

ই মেল- shaon.beng@presiuniv.ac.in

বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা- ৭০০০৭৩

PRESIDENCY UNIVERSITY
KOLKATA

গবেষণা-অভিসন্দর্ভের সূচি

প্রস্তাবনা

প্রথম অধ্যায় :

সময়ের পট : বিশ শতকের প্রথমার্ধ

দ্বিতীয় অধ্যায় :

সমকালীন ঔপন্যাসিকদের সৃষ্টিতে সময়ের চিহ্ন

তৃতীয় অধ্যায় :

ব্যক্তি জীবনানন্দ : ঔপন্যাসিকের মানসপ্রেক্ষিত

চতুর্থ অধ্যায় :

জীবনানন্দের উপন্যাস : সময়, সমাজ ও ব্যক্তি

ক) জীবনানন্দের উপন্যাসের একটি কেন্দ্রীয় বিষয় :
ব্যক্তিচরিত্রের সামাজিকসত্তা ও শিল্পীসত্তার দ্বন্দ্ব

খ) গ্রাম ও শহর : পরিবর্তনের চিহ্ন

গ) উপন্যাসের চরিত্র : মনোবিশ্লেষণের আলোকে

পঞ্চম অধ্যায় :

উপন্যাসের আঙ্গিকে প্রতিবিম্বিত সময় ও ব্যক্তিমন

ষষ্ঠ অধ্যায় :

উপন্যাসে কবিসত্তার ছায়াপাত

সপ্তম অধ্যায় :

উত্তরকালে জীবনানন্দের উপন্যাসের প্রাসঙ্গিকতা

উপসংহার

উল্লেখপঞ্জি

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

প্রস্তাবনা

রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কবিতার আকাশে জীবনানন্দ দাশ সম্ভবত উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। স্কুল-জীবন থেকেই তাঁর লেখা কবিতাগুলি পড়তে আমার ভালো লাগত। কতকটা বুঝে, কতকটা না বুঝে, বোঝা না-বোঝার সেতুবন্ধ পেরোতে পেরোতে ভালো লাগার পরিসর ক্রমশ উন্মুক্ত হচ্ছিল। পরবর্তীকালে, তাঁর উপন্যাস-ভুবনের যে সন্ধান আমি পাই, তা আমাকে বিস্মিত করে। সমাজ ও সভ্যতার উথালপাথাল সময়পর্বগুলি মানুষের মনে, তার অস্তিত্বে কীভাবে ছাপ ফেলে, তা অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছিলেন ঔপন্যাসিক জীবনানন্দ দাশ। কেমন করে একজন একক-মানুষ, সমষ্টির অন্তর্গত না হয়েও, ক্রান্তিকালের নানা মুখচ্ছবি নিয়েই গড়ে তোলেন তাঁর ভাবনাজগৎ, এ যেন তারই ভাষ্য। জীবনানন্দের উপন্যাস নিয়ে গবেষণার কাজে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকবৃন্দের মূল্যবান পরামর্শ ও স্নেহ নানা সময়ে পেয়েছি। আমার গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক ডক্টর শাওন নন্দী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডক্টর মোস্তাক আহমেদের কাছে কাজটি সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে আমি বিশেষভাবে ঋণী। জীবনানন্দের ঔপন্যাসিক-সত্তার ওপরে আমার কাজটি যদি নতুন ও মৌলিক কোনো আলো ফেলে থাকে, তবেই এই গবেষণাকর্মের সার্থকতা।

জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস : সময় ও ব্যক্তিমন

প্রথম অধ্যায় :

সময়ের পট : বিশ শতকের প্রথমার্ধ

‘আধুনিক সাহিত্য’ প্রবন্ধে গোপাল হালদার লিখেছিলেন যে সমাজ ও সাহিত্যের মধ্যে প্রভাবের সম্পর্কটি পারস্পরিক। স্বভাবতই, এ-দুটিই ক্রমপরিবর্তনশীল ও জীবন্ত। আর এরই প্রেক্ষাপটে রয়ে গেছে স্পন্দমান সময়ের ভূমিকা। অন্যদিকে ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত নিজের ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’-এর ভূমিকায় মহাশ্বেতা দেবী বলেছেন, “সাহিত্যকে শুধু ভাষা, শৈলী, আঙ্গিক নিরিখে বিচার করার মানদণ্ডটি ভুল। লেখকের লেখার সময় ও ইতিহাসের প্রেক্ষিত মাথায় না রাখলে কোনো লেখকেরই মূল্যায়ন করা যায় না।”[১] জীবনানন্দ দাশের উপন্যাসগুলির মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও তাঁর সময়পট অথবা ‘ইতিহাসের প্রেক্ষিত’টি অতঃপর গভীরভাবে প্রাসঙ্গিক। উনিশ শতকের তিরিশের দশকের প্রথমার্ধ এবং উনিশশো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দ—প্রধানত এই দুই পর্যায়ে জীবনানন্দ দাশ উপন্যাস রচনা করেছিলেন। বিশ শতকের প্রথমার্ধ সমগ্র পৃথিবী, ভারতরাষ্ট্র এবং বিশেষত বাংলার ক্ষেত্রে এক ক্রান্তিলগ্ন নিঃসন্দেহে। ক্রান্তির এই কালপর্বটিকে আমাদের গবেষণার প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। ১৯০৫-১১ খ্রিস্টাব্দব্যাপী বাঙালির বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন ইংরেজের বঙ্গভঙ্গ-পরিকল্পনাকে সফল হতে দেয়নি। কিন্তু ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশভাগের মূল্যে দেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ) আঁচে বাংলার বাজার অগ্নিবর্ষী হল—“বাংলায় যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বেকার দ্রব্যমূল্যের সূচক ১০০ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে দাঁড়ায় ২০১ ভাগে।”[২] মানুষের প্রাণের দামের থেকে জিনিসের দাম যখন ঊর্ধ্বমুখী, তখন রাওলাট আইন, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে অসহযোগী হয়ে উঠল এদেশীয় জনতা। পরবর্তী তিন দশকে মানুষ প্রত্যক্ষ করল—বিশ্বব্যাপী মন্দা (১৯২৮-২৯ খ্রিস্টাব্দ), দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫ খ্রিস্টাব্দ), মন্বন্তর (১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ), জাপানে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ (১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ), কলকাতা-নোয়াখালিতে ভ্রাতৃঘাতী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ), মর্মঘাতী দেশভাগের শর্তে স্বাধীনতা (১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ) ইত্যাদি। “সকলেই আড়চোখে সকলকে দেখে” (‘১৯৪৬-৪৭’) যখন, নষ্ট সেই সময়ে, দ্বিতীয়বার কবি জীবনানন্দ ঔপন্যাসিকের কলম হাতে তুলে নিলেন। ইতোপূর্বে ১৯৩১-৩৩

খ্রিস্টাব্দের সময়পর্বে ঔপন্যাসিক জীবনানন্দ একক ব্যক্তিমনের সংকটকে ভাষা দিয়েছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ের অস্থির আবহের অভিঘাত যে শিকড়হীনতার বোধের জন্ম দিয়েছে মানুষের মনে, সেই সূত্রেই জীবনানন্দের প্রথম পর্বের উপন্যাসের একক মানুষের সংকট, দ্বিতীয় পর্বে যুক্ত হয়েছে বিশ্বায়িত মানুষের সমষ্টিগত সংকটের সঙ্গে। যুদ্ধ-দাঙ্গা-মন্বন্তর-দেশভাগের সেই বস্তুপৃথিবীর উক্ত সময়পটটি, তাই ঔপন্যাসিক জীবনানন্দের বক্তব্যের বিবর্তনের রেখাপথকে চিনে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয়।

জীবনানন্দের যাপিত জীবনের এই সময়পর্বটি আমাদের গবেষণায় যে যে দিক থেকে আলোচিত হয়েছে, সেগুলি হল---

<u>বঙ্গভঙ্গ</u>

রাজনৈতিক অভিসন্ধি সফল করার লক্ষ্যে সুচতুরভাবে ইংরেজ শাসককুলের কর্তাব্যক্তিরা বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা করেছিলেন। তার পেছনে যেমন লক্ষ্য ছিল বাংলার রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে প্রশাসনিকভাবে কব্জা করা, তেমনই বাঙালি-পরিচয়কে এবং বাংলার সমাজকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত করে দুর্বল করে দেওয়ার চক্রান্তও তার মধ্যে দিয়ে করা হয়েছিল। এই সমস্ত গোপন পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার লক্ষ্যে, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের "১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হল। লর্ড কার্জন শাসনকার্যের সুবিধার জন্য রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ তিনটিকে আসাম প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশ গঠন করেন। রাজধানী হয় ঢাকা এবং গভর্নর নিযুক্ত হন স্যার র‍্যামফিল্ড ফুলার। বঙ্গের অবশিষ্ট দু'টো বিভাগ, দার্জিলিং জেলা, বিহার ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যাকে নিয়ে করা হল পশ্চিমবঙ্গ।"[৩]

বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব কার্যকর হওয়ার আগেই ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ই জুলাই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "দি বেঙ্গলী" পত্রিকার সম্পাদকীয় কলামে এই আসন্ন ঘটনাকে "একটি ভয়ংকর জাতীয় দুর্যোগ"(সূত্র- রমেশচন্দ্র মজুমদার ; 'হিস্ট্রি অব ফ্রিডম মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া' ; দ্বিতীয় ভাগ, ১৯৬৩, কলকাতা ; পৃষ্ঠা- ৭) বলে ব্যাখ্যা করেন। ঐ বছর ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হলে, "শিক্ষিত বাঙালি হিন্দুরা তীব্রভাবে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা শুরু করেন। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ২২ মাসে বাংলায় তিন হাজার সভা হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গের দিন অরন্ধন ও হরতাল পালিত হয়।"[৪] পাশাপাশি সম্প্রীতি রক্ষার্থে পালিত হয় রাখিবন্ধন উৎসব।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের অগ্রণী ভূমিকা প্রতিবাদমুখর বাঙালিকে ভাষা জুগিয়েছিল। অজস্র স্বদেশী গানের সম্ভার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রাণপণে বঙ্গভঙ্গ রোধ করতে এগিয়ে এলেন।

বিশ শতকের প্রথম দশকে বাংলা ভাগের চক্রান্ত রুখে দিতে পেরেছিল বাঙালি। কিন্তু ১৯৪৭ সালে এসে এই প্রতিরোধ আর সম্ভব হল না। এর ছ-বছর আগে রবীন্দ্রনাথ প্রয়াত হয়েছেন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা ও নোয়াখালিতে ঘটে গেছে ভ্রাতৃঘাতী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এর ফলে ধর্মের ভিত্তিতে দ্বিজাতিতত্ত্বের যে বীজ বিশ শতকের একেবারে শুরু থেকেই লর্ড কার্জনের হাত দিয়ে বাংলার মাটিতে পুঁতে দিয়েছিল ইংরেজ-প্রভু, তা-ই ফলবান হল ১৯৪৬-৪৭ খ্রিস্টাব্দে এসে। "দ্বিজাতিতত্ত্ব"-এর ভিত্তিতে "মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা" কার্যকরী হল। ফলশ্রুতিতে, বাঙলাকে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে বিভক্ত করে যথাক্রমে পাকিস্তান ও ভারতের অঙ্গীভূত করা হয়। দেশভাগের শর্তে আসে স্বাধীনতা। ১৯৪৭ সালের ১৪ই অগস্ট পাকিস্তান ও পরের দিন, ১৫ই অগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়।

বিশ্বযুদ্ধ ও মহামন্দা

জনৈক সার্বিয়ান যুবকের হাতে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফার্দিনান্দের হত্যার মধ্যে দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটলেও, এই মহাসমরের আসল কারণ লুকিয়ে ছিল অনেক গভীরে। শিল্পবিপ্লবের ফলে যন্ত্রশক্তিতে উন্নত ইউরোপের ঔপনিবেশিক দেশগুলি, সঙ্গে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান, বাজারদখল ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের জোগান, সস্তা শ্রম ও শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রির জন্য আদর্শ বাজার--- এগুলির দখল কে কীভাবে নিতে পারবে, সেটাই ছিল সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রপ্রভুদের প্রধান চিন্তার বিষয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ভারতবর্ষকে প্রধানত দুইভাবে প্রভাবিত করেছিল। একথা ভুলে যাওয়ার অবকাশ নেই যে ভারত তখন একটি পরাধীন দেশ। ইংরেজ সাম্রাজ্যের প্রভুর কাছে ভারতের বিপুল সৈন্য-সংখ্যা এবং সম্পদকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিয়োজিত না করার কোনো কারণ ছিল না। ফলে ভারতের লোকবল, অর্থ ও নানাবিধ রসদ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজদের কাজে লাগে। যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে দুদিক দিয়ে এর প্রভাব এদেশের ওপর পড়ে। প্রথমত, যুদ্ধের শেষে ভারতে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য, খাদ্যশস্য ইত্যাদির দাম বহুগুণ বেড়ে যায়। আরও নানা দিক থেকে সাধারণ ভারতবাসীর জীবন নির্বাহ করা দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ভারতের স্বায়ত্তশাসন ও এদেশের শিল্পের বিকাশ ঘটানোর যে প্রতিশ্রুতি শাসক ইংরেজের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছিল, তা বাস্তবায়িত না হওয়ায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপট আরও জোরালো হয়ে ওঠে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অগ্রগতির নিজস্ব নিয়মেই একদিন রচিত হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদের ভিত। সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের বাজার দখলের অন্তহীন খিদে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। যুদ্ধশেষে বাজার দখলের সমস্যাটি আপাতভাবে নিরসন করা হলেও, তার গর্ভেই থেকে গিয়েছিল

আরও একটি বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ-পরবর্তী অর্থনৈতিক মহামন্দার পরে তাই অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। মানবসৃষ্ট ইতিহাসের ভয়ঙ্করতম ধ্বংসলীলার ঢাকে কাঠি পড়ল। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের পয়লা সেপ্টেম্বর তারিখে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঘটা এই ভয়াল যুদ্ধের কোন কোন প্রভাব বাংলার তথা ভারতের ওপর পড়েছিল, এই অধ্যায়ে তা আলোচিত হয়েছে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম

বিশ শতকের প্রথমার্ধ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবময় সময়পর্যায়। শাসক ইংরেজের বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে বাংলায় যে গণ-সক্রিয়তার সূত্রপাত ঘটে, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তা নানা পরিবর্তিত আঙ্গিকে ও পরিবর্ধিতভাবে বহমান থাকে। এই সময়ে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর উত্থান (চম্পারণ সত্যাগ্রহ, ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ) অন্যতম প্রণিধানযোগ্য ঘটনা।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, বয়কট ও স্বদেশী, রাওলাট আইন, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ও রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ, খিলাফত, অসহযোগ, আইন অমান্য ও ভারত ছাড়ো আন্দোলন এই বর্ণময় সময়ের এক একটি দলিল। পাশাপাশি বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলনের ধারাটিও মনে রাখতে হবে।

১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের মন্বন্তর

১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের মন্বন্তর প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক সুমিত সরকার বলেছেন, "ব্রিটিশ শাসন সরাসরি শুরু হয় ১৭৭০-এর দুর্ভিক্ষ দিয়ে; আর এখন তেমনই এক বিপর্যয় দিয়েই ঘনিয়ে আসতে থাকে তার অন্তিম লগ্ন।"[৫] মাঝের এই ১৭৫ বছরের ইতিহাসে, বিশেষত ১৮৫০ সালের পর থেকে, সারা ভারতের কোনো না কোনো অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হয়ে উঠেছিল একটি নিয়ম। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের বাংলার মন্বন্তরকে তাই হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোনো বিপর্যয় বলে দেখার উপায় নেই। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির ধারাবাহিক জনবিরোধী নীতিই এই দুর্ভিক্ষগুলির সাধারণ কারণ। ১৯৪৩ সালের বাংলার মন্বন্তরের তিন চারটি প্রত্যক্ষ কারণ ছিল। আমাদের গবেষণায় এই কারণগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলায় ১৯৪৬-৪৭ খ্রিস্টাব্দের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার আগে থেকেই বাংলার হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার রণকৌশল নিয়েছিল শাসক ইংরেজ। বঙ্গভঙ্গ হলে পূর্ববঙ্গের ক্ষমতাশালী মুসলমানদের কী লাভ হবে, তা বক্তৃতার মাধ্যমে প্রচার করেছিলেন লর্ড কার্জন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা ও ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু মহাসভার স্থাপনা সাম্প্রদায়িক শক্তির মাথাচাড়া

দেওয়ার প্রমাণ। খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনের সময়ের হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, পরবর্তীতে আইন অমান্য আন্দোলনে সেভাবে দেখা যায়নি। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে, দেশভাগের শর্তে ভারতের স্বাধীনতার সম্ভাবনা যখন জোরালো হচ্ছিল, সেসময় বাংলা ও ভারতের মাটিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও গণহত্যার সবচেয়ে বীভৎস রূপটি দেখা যায়।

"১৬ই অগাস্ট ১৯৪৬ থেকে নজিরবিহীন মাত্রায় দাঙ্গার ফলে গোটা ভারতের প্রেক্ষাপট অতি দ্রুত পালটাতে থাকে। ১৬ থেকে ১৯ অগাস্ট কলকাতায় শুরু হয় দাঙ্গা। তারপর ১ সেপ্টেম্বর থেকে বোম্বাই ছুঁয়ে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে পূর্ববঙ্গের নোয়াখালি (১০ অক্টোবর), বিহার (২৫ অক্টোবর), যুক্ত প্রদেশের গড়মুক্তেশ্বরে (নভেম্বর) এবং মার্চ ১৯৪৭ থেকে পাঞ্জাবকে পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলে। সাম্প্রদায়িক ভাবাবেগের উস্কানি ছিল সর্বত্র দাঙ্গার উপাদান।"[৬]

দাঙ্গার ভয়াবহতা, শাসক ইংরেজ ও সাধারণ মানুষের ভূমিকা, মহাত্মা গান্ধীর ঐতিহাসিক ভূমিকা তথ্যসহ আমাদের গবেষণায় আলোচিত হয়েছে।

জীবনানন্দের উপন্যাসে বিশ শতকের প্রথমার্ধের বিশেষ সময়পটের প্রভাব

জীবনানন্দের কবিতায়, তাঁর লেখা প্রবন্ধে ও উপন্যাসে বারবার উল্লেখিত হয়েছে সময়ের প্রসঙ্গ। তাঁর সমকালীন সময়ের নানা ঘটনাস্রোতের উল্লেখ রয়েছে তাঁর সৃষ্টিতে। বিশ্বযুদ্ধ ও মহামন্দা একদিকে যেমন বাঙালি মধ্যবিত্তের চাকরির বাজারে সংকট সৃষ্টি করেছিল, তেমনই সম্পর্কের সঙ্কটও ঘনীভূত হয়েছিল। দেশভাগের ক্ষত মানুষের চৈতন্যকেই উদ্বাস্তু করে দিয়েছিল। জীবনানন্দ নিজে তার শিকার। স্বাধীনতার স্বপ্ন অচিরেই নানা স্বপ্নভঙ্গের খতিয়ান হাজির করেছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা জন্ম দিয়েছিল এক অবিশ্বাসের পৃথিবীর। সেই সব দিকগুলি আমাদের গবেষণায় গুরুত্ব দিয়ে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় :

সমকালীন ঔপন্যাসিকদের সৃষ্টিতে সময়ের চিহ্ন

মহৎ সাহিত্যকর্ম সৃষ্টির অন্যতম দিক হল সাহিত্যিকের পরিণত জীবনবোধ ও কালচেতনার সমন্বিত প্রকাশ। জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস রচনাকালে অতএব বাংলার প্রধান ঔপন্যাসিকেরা কীভাবে ভাষা দিচ্ছেন সমকালকে, সে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবেনা। উনিশশো "তিরিশের কাল বাঙালি মধ্যবিত্তের এই উপলব্ধির কাল যে, এই মধ্যবিত্তের ক্ষণস্থায়ী স্বর্ণযুগের অবসান ঘটেছে, গ্রামীণ মধ্যবিত্তের জীবন-রঙ্গমঞ্চে যবনিকা দুলছে, নোতুন পালা নোতুন করে বাঁধতে

হবে।”[৭] তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক---এই বন্দ্যোপাধ্যায়-ত্রয়ীর এবং সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাসে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এই নতুন সময়ের কথা ব্যক্ত হয়েছে।

আমাদের গবেষণার দ্বিতীয় অধ্যায়ে জীবনানন্দের সমকালীন এই চারজন ঔপন্যাসিককে বেছে নেওয়ার নির্দিষ্ট কারণ আছে। জীবনানন্দ স্বয়ং তিন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে তাঁর প্রবন্ধে (“দ্য বেঙ্গলি নভেল টুডে”) আলোচনা করেছেন। আর সতীনাথ একটি ভিন্ন অঞ্চলের সমাজপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে বিশ শতকের প্রথমার্ধের বদলে যাওয়া সময়কে ভাষা দিয়েছেন।

ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাপক, বিচিত্র অভিজ্ঞতা, যা তাঁর উপন্যাসের বিষয়কে জীবন্ত করে তুলেছে, তার উল্লেখ করেছেন প্রাবন্ধিক জীবনানন্দ। বাঙালি উপন্যাস-পাঠক তারাশঙ্করের উপন্যাসে পেয়েছে নবীনতার স্বাদ। তবুও জীবনানন্দের বিচারে তাঁর উপন্যাসগুলি মহৎ হয়ে উঠতে পারেনি লেখকের কল্পনাপ্রতিভার অভাবে। জীবনানন্দের এই মতামত একান্তই তাঁর ব্যক্তিগত। বরং আমরা দেখি, বীরভূমের বিশিষ্ট আঞ্চলিক ভূমিখণ্ডে পলেস্তারা খসে যেতে থাকা সামন্ততন্ত্র ও আধুনিক পুঁজিবাদের দ্বন্দ্বজাত মিথস্ক্রিয়া রূপ পেল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে। ‘হাঁসুলিবাঁকের উপকথা’র (১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ) কাহারপাড়ার অন্ধকারময় আদিম কৌমসমাজে রেলশহরের ব্যস্ততা হানা দেয়। এই দুই পৃথক সময়ের দ্বন্দ্বকে প্রতিনিধিত্ব করে বনোয়ারী ও করালী। আধুনিক পুঁজিবাদের চাপে, বৃত্তিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজ কীভাবে ভেঙে পড়ছে, তার বিশ্বাস্য ছবি রয়েছে ‘গণদেবতা’র (১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ) শুরুতেই। ছিরে পালের শ্রীহরি ঘোষে ‘উত্তরণ’ সেইসময়ের সামাজিক শ্রেণি সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিপাতের ফসল। ‘ধাত্রীদেবতা’তেও (১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ) নায়ক শিবনাথ ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের শিকার। যুগদ্বন্দ্বের প্রাধান্য সত্ত্বেও তারাশঙ্কর শেষত মানুষের শুভবোধে আস্থাশীল থাকতে চেয়েছেন।

প্রকৃতি-চেতনা, স্বদেশ-জিজ্ঞাসা এবং জীবনের জঙ্গমতার বোধ বাংলা উপন্যাসক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দান। যদিও জীবনানন্দের বিচারে, তারাশঙ্করের তুলনায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞতা সীমিত। কিন্তু উচ্চস্তরের কল্পনাশক্তি তাঁর উপন্যাসগুলিতে বিদ্যমান। অন্তত বিভূতিভূষণের “পথের পাঁচালী” সম্পর্কে জীবনানন্দ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তাঁর মতে, এত গুণ থাকা সত্ত্বেও, কল্পনার এমন স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত প্রকাশ থাকা সত্ত্বেও, শেষ পর্যন্ত টলস্টয় বা রবীন্দ্রনাথের মতো মহৎ হয়ে উঠতে পারেনি বিভূতিভূষণের উপন্যাস। তার কারণ, উপন্যাসগুলি আবেগপ্রবণ এবং বিষণ্ণ। জীবনানন্দের বিচারের সঙ্গে সশ্রদ্ধ দূরত্ব রেখে বলা যায়, ‘পথের পাঁচালী’ (১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ) ও ‘আরণ্যক’ (১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ)--- এই দুটি উপন্যাসে, মানুষের প্রিয় পরিচিত পরিপার্শ্বের অবসানের পদধ্বনি শোনা গেছে। অপু-দুর্গার প্রাণোচ্ছল জগৎ, মহালিখারূপের জ্যোৎস্নালোকিত মোহাবিষ্টতার মধ্যে কখন আমাদের অজান্তেই বাসা বাঁধে ঘুণপোকা—হয়তো তা

বিশ্বযুদ্ধেরই গর্ভজাত। প্রশ্নাকুল অপু তাই জীবনের ঘাটে ঘাটে ধাক্কা খেতে খেতেই এগিয়ে চলে। তবু কোনো এক আস্তিক্যবোধ ও পরম বিশ্বাস যেন লেখককে আগলে রাখে।

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে দাঁড়িয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে স্থির কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি প্রাবন্ধিক জীবনানন্দ দাশ। তাঁর লেখায় তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন প্রাণশক্তির প্রকাশ, বিস্তৃত অভিজ্ঞতা এবং বিভূতিভূষণের মতোই খাঁটি কল্পনাশক্তি। জীবনানন্দ এও বলেছেন যে, মানিক স্মৃতিকাতরতায় ভোগেন না, তিনি চিন্তাশীল এবং বিশ্লেষণাত্মক লেখক। তবুও তাঁর মতে 'পুতুলনাচের ইতিকথা' বড়জোর খুব ভাল গল্প, দ্বিতীয়বার পাঠেই যার ধার মরে যায়। তাঁর বিচারে মানিকের সফল উপন্যাস হল 'পদ্মানদীর মাঝি'।

তারাশঙ্করের উপন্যাসে কৌমচেতনার বিপ্রতীপে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে চরিত্রের নিজস্ব দ্বন্দ্ব দৃশ্যমান। মানুষের যৌনচেতনার অন্ধিসন্ধির হালহদিশও করা হয়েছে তাঁর উপন্যাসে। 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র (১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ) শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শশী ডাক্তার কলকাতা ও গাউদিয়ার সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত হয়েছে। এক অর্থে, তৎকালীন বাঙালির দ্বিধা ও হতাশার আরেক প্রতিনিধি 'পদ্মানদীর মাঝি'র (১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ) কুবের। মালা নাকি কপিলা, ময়নাদ্বীপের রহস্যাবৃত জগৎ নাকি চিরপরিচিত পদ্মার কোল—এইসব দ্বন্দ্বে দীর্ণ হয়েছে কুবেরের অস্তিত্ব।

আঙ্গিকসচেতন ঔপন্যাসিক সতীনাথ ভাদুড়ী উত্তর-বিহারের স্থানিকতায় নতুন আখ্যানের জন্ম দিলেন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের অগাস্ট আন্দোলনের পটভূমিতে একটি রাজনৈতিক পরিবারের আদর্শগত বিভিন্নতাকে তিনি ভাষা দিলেন 'জাগরী' (১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ) উপন্যাসে। ফাঁসি সেলে বিলু, আপার ডিভিশন ওয়ার্ডে বাবা, আওরত কিতায় মা এবং জেল গেটে নীলুর অশ্রুতপূর্ব বয়ানে, নিছক মধ্যবিত্ত পারিবারিক আদর্শের বদলে বৃহত্তর মতাদর্শের দ্বন্দ্ব প্রকাশ পেল। 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' (১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ) সতীনাথের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ঢোঁড়াইয়ের জীবনের প্রতিটি ঘটনার সুনির্দিষ্ট বিবৃতির মাধ্যমে তিনি উপন্যাসটিকে বিশ্বস্ততা দিয়েছেন। তাৎমাটুলি পর্বের সীমাবদ্ধ জীবনের গণ্ডি পেরিয়ে বিসকান্ধার বৃহত্তর পরিসরে একইসঙ্গে কৃষিনির্ভর ও নতুন দিনের ভারতবর্ষের সঙ্গে পরিচয় ঘটে ঢোঁড়াই-এর। 'জাগরী'র ডায়েরির পাতা থেকে শুরু করে রামচরিতমানসের ফ্রেমে আঁকা ঢোঁড়াই-আখ্যানে সেই নতুন ভারতবর্ষের কথাই লেখা হয়েছে।

শক্তিমান বাঙালি ঔপন্যাসিকদের কলমে বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা উপন্যাস নানামাত্রিক বিস্তারে, বর্ণবহুলতায় যুগান্তরের চিহ্নকে সফলভাবে ধারণ করেছিল। এই বর্ণবহুল সময়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে জীবনানন্দ আঁকলেন তাঁর ধূসর পৃথিবীকে। তাঁর উপন্যাস ও কথাসাহিত্যে আমরা পাই গ্রাম ও শহরের পরিবর্তমান জীবনের ছবি। মানুষের যাপনের নিভৃত যন্ত্রণা ও ক্ষয়কে তিনি তুলে আনলেন তাঁর উপন্যাসে। যাপিত মানুষের প্রাত্যহিকতার নিচে চাপা পড়া মনের দ্বন্দ্ব-

জটিল-জর্জর পাণ্ডুরতাকে তাঁর উপন্যাস ছুঁয়ে দেখতে চাইল। জীবনানন্দের উপন্যাস সম্পর্কে একথা বিশেষভাবে বলতে হবে যে, জটিল সময়ের ঘূর্ণাবর্তে জর্জরিত মানবমনকে আবিষ্কারের ক্ষেত্রে তাঁর দেখার চোখটি নতুন। সেই নতুন দৃষ্টি জীবনের বহিরঙ্গের বর্ণচ্ছটা পরিহার করে ডুব দিতে চেয়েছে অন্তর্লীন, গভীরতর বাস্তবে। তাই তাঁর উপন্যাস একাধারে নতুন এবং গভীর।

জীবনানন্দের মতে, কোন কোন গুণ থাকলে একটি উপন্যাস মহত্ত্বের দাবি জানাতে পারে? তাঁর মতকে মানদণ্ড ধরলে, ঔপন্যাসিকের বিস্তৃত অভিজ্ঞতা, সুন্দর বা শক্তিশালী প্লট থাকলেই উপন্যাস মহৎ হয় না। এসবের অতিরিক্তভাবে চাই লেখকের উচ্চ কল্পনাপ্রতিভা ও প্রাণশক্তির সংশ্লেষে গড়ে ওঠা জীবনবোধ। চাই ঔপন্যাসিকের নৈর্ব্যক্তিক মনন। কিন্তু তাঁর এই বিশ্লেষণ অনুযায়ী কোথায় রাখব আমরা স্বয়ং ঔপন্যাসিক জীবনানন্দকে? অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তী বলেছেন, "তাঁর (জীবনানন্দের) উপন্যাসগুলি নানাদিক দিয়ে বিশিষ্ট কিন্তু তাঁর নিজের প্রদত্ত মানদণ্ডেই 'great' তাদের বলা চলে না।"[৮]

"The Bengali Novel Today" (The Hindustan Standard পত্রিকায় ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত) প্রবন্ধটি জীবনানন্দ লিখেছেন ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে। তার পর আজ প্রায় সত্তর বছর অতিবাহিত হয়েছে। এই সত্তর বছরে নতুনভাবে প্রাসঙ্গিক হয়েছেন ঔপন্যাসিক জীবনানন্দ। আবার এই কথাও অনস্বীকার্য যে ব্যাপক অংশের বাঙালি উপন্যাস-পাঠকের হৃদয়ে এই বন্দ্যোপাধ্যায়-ত্রয়ী স্থায়ী আসন লাভ করেছে। এই তিনজন এবং সতীনাথ ভাদুড়ী বিশ শতকের প্রথমার্ধের এবং জীবনানন্দের সমকালীন প্রধান চারজন বাঙালি ঔপন্যাসিক। তাই বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের দ্বন্দ্ব-জটিল নতুন সময়ের চিহ্নগুলি এই চারজন ঔপন্যাসিকের সৃষ্টিতে কীভাবে রেখাপাত করেছে, তার একটি সাধারণ ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

তৃতীয় অধ্যায় :
ব্যক্তি জীবনানন্দ : ঔপন্যাসিকের মানসপ্রেক্ষিত

"It is not the extent of experience that will tend to make a novel great, but the requisite vision and the intellect of the novelist, even though his experience is somewhat restricted, and the material at his command, scarcely anything more than diversified autobiography."[৯]

"দ্য হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড" পত্রিকায় ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে "দ্য বেঙ্গলি নভেল টুডে" নামে জীবনানন্দ দাশের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইংরেজিতে লেখা সেই প্রবন্ধের শেষাংশ

ওপরের বক্তব্যটিতে উদ্ধৃত। এই অধ্যায়ের আলোচনার প্রবেশক হিসাবে, এই প্রবন্ধটির সম্পূর্ণ শেষ অনুচ্ছেদের বাংলা তর্জমা এখানে উদ্ধৃত করা অসমীচীন হবে না। তিনি লিখেছেন---

" আমাদের সময়ের ভয়ঙ্কর চাপ প্রতিটি ব্যক্তিমানুষকে শুধুমাত্র তার নিজের মধ্যে বা তার সুপরিচিত অক্ষের ভেতরদিকে টানছে। সুনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতারাশির হাজারো বৈচিত্র্যের যোগে সমাজের একক হিসেবে মানুষের বা তার অংশ হিসেবে একজন ঔপন্যাসিকের জীবন যে সত্যই বিস্তৃততর ও মহনীয় হয়ে উঠবে, তার কোনও সুযোগই প্রায় এখন নেই। হাতে গোনা কিছু ব্যতিক্রমী মানুষের (তারা যে ঔপন্যাসিকই হবেন, এমন নিশ্চয়তা নেই।) উদাহরণ এ-যুগে পাওয়া যেতে পারে, যাদের জীবনে সেই ব্যাপক অভিজ্ঞতা রয়েছে। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আবার এরাও জানেন না যে তাদের ঐ অভিজ্ঞতা কোন কাজে লাগবে। বিচিত্র ও জরুরি মানব-অভিজ্ঞতার কতটুকু ধারণ করতে পেরেছে, তার নিরিখে একটি উপন্যাসের মহত্ত্ব বা গুরুত্ব নির্ধারিত হয় না। অভিজ্ঞতার বিস্তৃতি একটি উপন্যাসকে মহৎ করে তোলে না। উপন্যাস মহনীয় হয় ঔপন্যাসিকের প্রয়োজনীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও মেধার গুণে। ঔপন্যাসিকের অভিজ্ঞতা কিছুক্ষেত্রে সীমিত হলেও, বৈচিত্র্যপূর্ণ আত্মজীবনের গভীরে ডুব দিয়েই আসলে তাঁকে সংগ্রহ করতে হবে আধুনিক উপন্যাসের উপাদান।" (গবেষককৃত অনুবাদ)

আধুনিক সময়ের মহৎ উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে গিয়ে প্রাবন্ধিক যে বক্তব্য এখানে রেখেছেন, সে ব্যাপারে মতামতটি তাঁর নিজস্ব। এমন হতেও পারে যে উপন্যাসমাত্রই "Diversified Autobiography" হবেই, তা আধুনিক পাঠক বা একালের সমালোচক মনে করেন না। তেমন কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনো এই লেখার উদ্দেশ্যও নয়। আমরা শুধু এখান থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ঔপন্যাসিক জীবনানন্দ যখন উপন্যাস লিখছেন, তখন প্রাবন্ধিক জীবনানন্দের উপন্যাস সম্পর্কে এই ভাবনাগুলি তাঁর মনে ক্রিয়াশীল থাকাই স্বাভাবিক।

জীবনানন্দের ব্যক্তিজীবনের যে যে দিকগুলি তাঁর উপন্যাসে বিশেষভাবে রেখাপাত করেছে সেগুলি সম্পর্কে এই অধ্যায়ে আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি। সেগুলি হল---

চাকরিকেন্দ্রিক সংকট

অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তী তাঁর 'জীবনানন্দ : সমাজ ও সমকাল' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন--- "জীবনানন্দের উপন্যাসের সামগ্রিক থিম বা বিষয়বস্তুর সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে দেখি, অত্যন্ত সিরিয়াস লেখক ছিলেন তিনি। মানুষের জীবনের আদি সংকট, মৌল সংকট-টি কোথায়--- তারই সন্ধান করতে চাইছিলেন। তাঁর উপন্যাসের অনুসরণে আমাদের মনে হয়--- মানুষের সমাজে ও সভ্যতায়--- দুটি মূল সংকট তিনি চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁর মতে তার একটি হল টাকা।"[১০]

বিংশ শতাব্দীর দুই তিন ও চারের দশকে, যখন সারা বিশ্বের ব্যাপক অর্থনৈতিক মন্দার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভারতবর্ষ তথা বাংলায় চাকরি দুর্লভ হয়ে উঠেছে, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়েই চলেছে, সেই সময়ে বেকার-আধাবেকার জীবনানন্দকে চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতে হয়েছে। 'কল্যাণী', 'বিভা', 'মৃণাল'--- জীবনানন্দের এই উপন্যাসগুলির মতো যেগুলির কেন্দ্রীয় চরিত্র কোনও নারী, সেগুলি ছাড়া তাঁর প্রায় সমস্ত উপন্যাসে কেন্দ্রীয় চরিত্রের চাকরিসংক্রান্ত সংকট একটি প্রধান বিষয়।

দাম্পত্য সংকট

'দিনলিপি'র একাধিক এন্ট্রিতে স্ত্রী লাবণ্য দাশ সম্পর্কে এমন সব মন্তব্য জীবনানন্দ লিখে গিয়েছেন যে শুধুমাত্র সেগুলো পড়লে, জীবনানন্দকে সমগ্রত না জানলে, তাঁকে স্ত্রী-বিদ্বেষী বলেও প্রতিপন্ন করা সম্ভব। ২৩ অক্টোবর ১৯৩০-এর ডায়েরির এন্ট্রিতে তিনি লিখেছেন, "বউ : হাতি পোষা।" আবার ১৬ ডিসেম্বর ১৯৩৩ এ তিনি বলছেন, "Our marriage is scrap... কী করব? আত্মহত্যা? হার্টফেল? শীতের রাতে অন্ধকার পুকুরে ডুবে মরব?" এই প্রসঙ্গগুলির দিকে যথাযথভাবে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন জীবনানন্দ-গবেষক গৌতম মিত্র। "এইসময় সংবাদপত্র শারদীয়া ১৪২২" সংখ্যায় "জীবনানন্দ দাশের ডায়েরি : এক অপব্যয়ী অক্লান্ত আগুন" শীর্ষক বিশেষ রচনায় তিনি মন্তব্য করেছেন, "এক অসুখী দাম্পত্যের ভার আজীবন জীবনানন্দকে বইতে হয়েছে। অন্তত দিনলিপি সেই কথাই বলে।"[১১]

'দিনলিপি'র সংকেতময় লেখনী কবির দাম্পত্যের 'অসুখ'কে রহস্যাবৃত রাখতে দেয়নি। কালো ট্রাঙ্কের থরে থরে সযত্নরক্ষিত 'দিনলিপি'র পাণ্ডুলিপি দাম্পত্য-জট-জটিলতার আবরণ উন্মোচন করেছিল, একথা সত্যি। যা দিনের আলোর মতো প্রকট হয়েছিল 'দিনলিপি'তে, 'মাল্যবান' থেকে শুরু করে জীবনানন্দের প্রায় সবকটি উপন্যাসেই সেই সম্পর্ক-জটের প্রচ্ছন্ন দিকটি ভরপুর রয়ে গেছে। অন্তত দাম্পত্য সম্পর্কের নিরিখে তাঁর "দিনলিপি" ও উপন্যাসগুলি যেন একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ।

কবিস্বভাব

লাবণ্য দাশকে সাংসারিকতার ওপরে ওঠার কথা বলেছিলেন জীবনানন্দ। স্ত্রী একদিনের জন্যও কবিতার আলোচনায় অংশ নেন না বলে আক্ষেপ করেছিলেন। 'মানুষ জীবনানন্দ' গ্রন্থে লাবণ্য দাশের বয়ানেই আমরা একথা জানতে পেরেছি। দাম্পত্য-সম্পর্কের জটিলতা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে এটা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। এখন অন্যদিক থেকেও প্রসঙ্গটির দিকে আমরা তাকাব। শুধুমাত্র কবিতা নিয়েই একটা গোটা জীবন যেন বেঁচে গিয়েছেন জীবনানন্দ। তাঁর সেই কবিস্বভাবের স্পষ্ট ছাপ আমরা পড়তে দেখেছি তাঁর একাধিক উপন্যাসে।

অন্য নারী

জীবনানন্দের উপন্যাসেও আমরা খুঁজে পাব নারীর দুটি রূপকে। বেকার, প্রায় বেকার অথবা কোনোক্রমে সচ্ছল স্বামীর বিপরীতে সংসারের সংগ্রামে সংঘর্ষরত, অতএব কিছুটা বিরক্ত স্ত্রীদের দেখা যায় তাঁর উপন্যাসগুলিতে। আবার তাঁর নায়করা প্রায়শই চাকরির অনিশ্চয়তা, দাম্পত্যের সম্পর্কহীনতা আর এই হিংস্র নির্মম পৃথিবীর সঙ্গে সংলগ্ন হতে বাধ্য হয়ে আশ্রয় খুঁজেছে অন্য এক নারীকল্পনায়। উপন্যাসে, কবিতায় এই নারীদের প্রসঙ্গ যেভাবে এসেছে, তাতে এক কথায় তাদের মনে হয় রহস্যময়ী। 'বনলতা সেন'-এর কবি, তাঁর কবিতায় যেমন একাধিকবার সেই প্রসঙ্গ এনেছেন, তাঁর উপন্যাসগুলিও তার ব্যতিক্রম নয়। তাঁর প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসগুলির মধ্যে 'কারুবাসনা' (বনলতা), 'প্রেতিনীর রূপকথা' (বিনতা), 'মৃণাল' (মৃণাল) উপন্যাসে এই নারীদের আমরা দেখি। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে লেখা উপন্যাসগুলির মধ্যে 'জলপাইহাটি' ও 'সুতীর্থ' উপন্যাসেও এই নারীরা বর্তমান।

শিল্পের প্রয়োজনে নারীর পূর্ণতর রূপের আদলে শিল্পীরা তাকে গড়েছেন অজস্রবার। পুরুষ, বা সমগ্রত মানুষ যে জীবন পেতে চায় এবং আসলে যে খণ্ডজীবনের অলিন্দে দিনানুদিন তাকে বাঁধা পড়ে থাকতে হয়--- এই দুই অসমঞ্জস অবস্থার ব্যবধানকে ঘুচিয়ে দেয় সেই কল্পনারী। কল্পনার গুরুত্বই এই যে তা মানুষকে সম্পূর্ণতর মুক্তির এক আকাশ দেয়। জীবনানন্দের উপন্যাসে সেইসব নারীদের বিশিষ্টতার দিকগুলি, তাদের সম্ভাবনা ও বাধা পার হতে না পারার দিকগুলি বিশেষভাবে দেখানো হয়েছে। আমাদের গবেষণার এই অধ্যায়ে এই বিশিষ্টতাগুলিকে খুঁজে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে।

জীবনানন্দের ব্যক্তিজীবনসংলগ্ন অন্যান্য কয়েকটি দিক

জীবনানন্দের ব্যক্তিজীবনের আরো কতকগুলি দিক ধরা পড়েছে তাঁর উপন্যাসগুলিতে। সেই দিকগুলির ছাপ অনেক ক্ষেত্রে স্পষ্ট, কখনো আবার কিছুটা অস্পষ্ট। সেগুলো উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয় হয়তো হয়ে ওঠেনি, হয়ে ওঠার দাবিও হয়তো ছিল না সেগুলির। তবু সেইসব দিক দিয়ে দেখলে জীবনানন্দের মনোজগৎ আরও সামগ্রিকভাবে ধরা পড়ে। বরিশালের ব্রাহ্মসমাজের উত্থান- পতন, কলকাতার মেসজীবন, তৎকালীন শিক্ষার হাল ইত্যাদি সম্পর্কে জীবনানন্দের মতামত তাঁর উপন্যাসেও প্রভাব ফেলেছে।

<u>চতুর্থ অধ্যায় :</u>

<u>জীবনানন্দের উপন্যাস : সময়, সমাজ ও ব্যক্তি</u>

"জীবনানন্দ দাশ যে গল্প উপন্যাসও লিখেছেন, এবং ভূরিপরিমাণ, তাঁর জীবনকালে তা তত পরিচিত ছিল না। ১৯৪৬ এর একখানি পত্রে তাঁকে লিখতে দেখি, ছেলেবেলা থেকেই স্বদেশী-বিদেশী গল্প উপন্যাস তিনি নেহাত কম পড়েননি এবং তাঁর ঔপন্যাসিক হবার ইচ্ছা ছিল, এখনও তা ঘোচেনি। এ ইচ্ছার নেপথ্যের কথা নেপথ্যেই ছিল তখন, আর বহু দিন। ১৯৫০ এ 'আজকের বাংলা উপন্যাস' নিয়ে তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন, অর্থকষ্ট কাটাতে স্বয়ং ছদ্মনামে উপন্যাস লেখার প্রস্তাব করেছেন সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে, শোনা যায় 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদককেও, অজিত দত্তের নবপ্রতিষ্ঠিত দিগন্ত পাবলিশার্সের আনুকূল্য চেয়েছেন পূর্ণাকার উপন্যাস ছাপাতে"[১২]।

ঊনিশশো ছাব্বিশ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে ঊনিশশো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ বাইশ তেইশ বছরে জীবনানন্দ দাশ অন্তত কুড়িটি উপন্যাস রচনা করেছেন। এই অধ্যায়ের আলোচনার শুরুতেই তাঁর লেখা উপন্যাসগুলির রচনাকাল অনুসারে একটি তালিকা প্রস্তুত করা অসঙ্গত হবে না। উপন্যাসগুলি রচনার বহু পরে, ঔপন্যাসিকের অবর্তমানে প্রকাশিত হয়েছে। বহু ক্ষেত্রে জীবনানন্দের একেবারে শেষের দিকের লেখা উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে সবার আগে, আগের উপন্যাসগুলি প্রকাশিত হয়েছে অনেক পরে। তাই তাঁর লেখা উপন্যাসগুলির তালিকা প্রস্তুত করতে গিয়ে আমরা রচনাকালকেই মাথায় রাখতে চাই, প্রকাশকালকে নয়। তা না হলে ঔপন্যাসিক জীবনানন্দের শিল্প-বক্তব্যের বিবর্তনের জায়গাটি অস্পষ্ট থেকে যেতে পারে। প্রতিক্ষণ (কলকাতা) এবং গতিধারা (ঢাকা) প্রকাশনী সংস্থা থেকে ১০ই জানুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত জীবনানন্দের লেখা উপন্যাসগুলি ও তার প্রকাশকাল নিম্নরূপ :

১। 'জ্যোতি' – ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ

২। 'পূর্ণিমা' – নভেম্বর, ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ (বরিশাল)

৩। 'কল্যাণী' – জুলাই, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ

৪। 'আমরা বেশ আছি' – জুলাই, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ (কলকাতা)

৫। 'চৌত্রিশ বছর' – আগস্ট, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ (কলকাতা)

৬। 'সফলতা নিষ্ফলতা' - আগস্ট, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ

৭। 'কলকাতা ছাড়ছি' – সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ (কলকাতা, বরিশাল)

৮। 'অতসী' – অক্টোবর, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ

৯। ‘আমরা চারজন’ – জানুয়ারি, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ (কলকাতা)

১০। ‘বিভা’ – ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ

১১। ‘মৃণাল’ – ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ

১২। ‘নিরুপম যাত্রা’ – মার্চ, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ

১৩। ‘বিরাজ’ – আগস্ট, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ

১৪। ‘কারুবাসনা’ – আগস্ট, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ (বরিশাল)

১৫। ‘জীবনপ্রণালী’ – আগস্ট, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ

১৬। ‘প্রেতিনীর রূপকথা’ – আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ (কলকাতা)

১৭। ‘জলপাইহাটি’ – এপ্রিল-মে, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ (কলকাতা)

১৮। ‘সুতীর্থ’ - মে-জুন, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ (কলকাতা)

১৯। ‘মাল্যবান’ – জুন, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ (কলকাতা)

২০। ‘বাসমতির উপাখ্যান’ - ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ (কলকাতা)

এ কথা উল্লেখ্য যে, ‘সফলতা নিষ্ফলতা’ উপন্যাসটি অতি সম্প্রতি গৌতম মিত্রের সম্পাদনায় ‘নভেলের পাণ্ডুলিপি’ (ঋত প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০১৮) নামে আবার প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া ‘জীবনযাপন’ নামের তাঁর আরও একটি উপন্যাসের একটিমাত্র খাতা পাওয়া গেছে। এটির রচনাকাল সম্বন্ধে এখনও স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায়নি। এখানে এ কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রচনাকালের নিরিখে জীবনানন্দের উপন্যাসের এই তালিকা অসম্পূর্ণ হওয়ার একটা সম্ভাবনা থেকে যায়। কারণ অতি সাম্প্রতিককালেও জীবনানন্দের একাধিক গ্রন্থ প্রথমবারের জন্য প্রকাশিত হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে যে তাঁর লেখা নতুন কোন উপন্যাস প্রকাশিত হবে না, এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। তবুও একথা আজ অবশ্যই বলা যায় যে, জীবনানন্দের প্রতিনিধিস্থানীয় উপন্যাসগুলি আজ প্রকাশিত হয়ে গেছে, এবং তা থেকে জীবনানন্দের উপন্যাসের মুখ্য বিষয়-ভাবনা ও কাঠামোটি পাঠকের কাছে হাজির হয়ে গেছে। জীবনানন্দ দাশের উপন্যাসগুলির বিষয়কেন্দ্রিক আলোচনা এই অধ্যায়ে আমাদের লক্ষ্য। বিষয়গত প্রয়োজনে আমরা অধ্যায়টিকে তিনটি দিক থেকে আলোচনা করেছি। সেগুলি হল---

ক) জীবনানন্দের উপন্যাসের একটি কেন্দ্রীয় বিষয় : ব্যক্তিচরিত্রের সামাজিকসত্তা ও শিল্পীসত্তার দ্বন্দ্ব

জীবনানন্দের উপন্যাস রচনার প্রধান দুটি পর্যায়ের (প্রথম পর্যায়- ১৯৩০-এর দশকের প্রথমার্ধ, দ্বিতীয় পর্যায়- ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ) কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। উপন্যাসের বক্তব্যের নিরিখে

এই দুই পর্যায়ের বিভিন্নতার সূত্রে শিল্পী জীবনানন্দের মানসলোকের উত্তরণপথটিকে খুঁজে নিতে চেষ্টা করব আমরা।

তাঁর প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসগুলিতে (যেমন—'পূর্ণিমা'-১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ, 'কারুবাসনা'-১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ, 'জীবন প্রণালী'-১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ), এমনকী দ্বিতীয় পর্যায়েও কেন্দ্রীয় চরিত্রের চাকরিতে অনীহা বিদ্যমান। বিত্তের বৈভবে বিমুগ্ধ যাপনের জন্য না হলেও, রুটি-রুজির প্রয়োজনেই তো রোজগারের দরকার। তবে কেন এই বিমুখতা?

"কবিদের কেবলই বেদনা/ আহা কেবল বেদনা বুঝি ভালোবাসে তোমার হৃদয়?"[১৩] এ যেন জীবনানন্দের প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসের নায়কদের প্রাণের কথা। যে কোন সৎ শিল্পযাত্রিকের কারুকর্মই এক অর্থে প্রান্তিক। অন্যভাবে বললে, শকুনের মত উদ্যতনখ এ সভ্যতায় সাংসারিকতার আশীর্বাদ পাওয়াই হয়তো কারুকর্মীর তথা তাঁর শিল্পের পক্ষে অভিশাপ। এই প্রান্তিকতা, এই বেদনাবোধই জীবনানন্দের নায়কদের স্থিতধী হতে দেয় না। 'কারুবাসনা'র হেম "কারুকর্মীর এই জন্মগত অভিশাপ" বুকে বহন করে নিয়ে বেড়ায়। অথচ বিজ্ঞাপনে মুখ ঢাকতে না চাওয়া কবিজন্মপ্রত্যাশী এই হেম, 'নিরুপম যাত্রা'র প্রভাত, 'প্রেতিনীর রূপকথা'র (১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ) সুকুমার শেষাবধি মুখর এই পৃথিবীর মানুষ হিসেবেই রক্তমাংসের সুখসুবিধা, সুব্যবস্থা চায় বইকি। এখানেই এক ভয়ংকর অন্তর্বিরোধে দীর্ণ হয় জীবনানন্দের প্রথম পর্বের উপন্যাসের নায়করা—সৎ শিল্পযাত্রিকের আকাঙ্ক্ষিত নিঃসঙ্গতা ও সামাজিক মানুষের অনাকাঙ্ক্ষিত সঙ্গহীনতার যুগপৎ দ্বন্দ্বই তাদের মানসিক অস্থিতি ও অস্থিরতার মৌল কারণ।

খ) গ্রাম ও শহর : পরিবর্তনের চিহ্ন

জীবনানন্দের সমস্ত উপন্যাসে গ্রাম অথবা মফসসল এবং কলকাতা শহরের ভৌগলিকতায় আখ্যানকে নির্মিত হতে দেখি আমরা। প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসগুলিতে প্রায় সমস্ত কেন্দ্রীয় চরিত্র কলকাতার মায়াহীন নৈরাশ্যে জর্জরিত হলে ফিরতে চেয়েছে গ্রামে। গ্রামে বসবাসরত অবস্থায়, শত অপমানভোগের যন্ত্রণা সত্ত্বেও, গ্রামের উক্ত কল্যাণী-স্পর্শটি তখনও তাদের চেতনায় জাগরূক ছিল। বিপরীতক্রমে, একমাত্র 'বাসমতির উপাখ্যান' ছাড়া জীবনানন্দের দ্বিতীয় পর্যায়ের উপন্যাসের নায়করা আখ্যানের মুখ্য অংশ জুড়েই কলকাতাবাসী। একদা 'রূপসী বাংলা'য় বিমুগ্ধ কবির পর্বান্তরের উপন্যাসে এই গ্রামবিমুখতার কারণ কী?

ক্ষেমেশকে বস্তুপৃথিবীর আঁচ সম্পর্কে সাবধান করে সুতীর্থ বলে—"একদিকে বিরুপাক্ষের মতন ভাম আর একদিকে তোমার মতন খরগোসকে দেখে সুন্দরবনের পরীরা তামাশা বোধ করতে পারে, কিন্তু বাইরের পৃথিবীতে গুলি খেয়ে মরতে হবে তোমাদের"[১৪]। 'জলপাইহাটি'তে (১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ) যে অর্চিতার মধ্যে দুদণ্ডের শান্তি পেয়েছিল নিশীথ, তাকে ছেড়ে যুদ্ধের বাস্তবতায়

কলকাতার বৃত্তে পাড়ি জমাতেই হয় তাকে। প্রকৃতপক্ষে, কলকাতার নিষ্ঠুর নাগরিকতা মফসসলি-আদল নিয়েই তখন জলপাইহাটিতে শিকড় গাড়ছে। গুণগতভাবে বদলে যেতে থাকা সময়পটে কীভাবে আক্রান্ত হচ্ছে কেন্দ্র ও পরিধি দুইই, কীভাবে তৈরি হচ্ছে কেন্দ্র ও পরিধির নয়া সমীকরণ, 'জলপাইহাটি'তে তারই নির্যাস। বস্তুত 'কলকাতা' গ্রাস করছে 'জলপাইহাটি'কে। কলকাতা কি আর শুধুমাত্র "ভূগোলেতিহাসের কোন অক্ষে স্থিত"[১৫] এক স্থানখণ্ড? "ক্রমস্থানের কোন যুক্তিতে গ্রন্থিত তার নামরূপ? কেউ ঠিক জানে সাংঠিকানা, সদর 'কলকাতা'র?"[১৬] বিনয় ঘোষ তাঁর রচনাকর্মে বদলে যেতে থাকা কলকাতাকে পাঠকের সামনে হাজির করলেন। তারাশঙ্কর অথবা বিভূতিভূষণের উপন্যাস আমাদের পরিচয় করায় সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে থাকা ভারতের গ্রামসমাজের সঙ্গে। আর জীবনানন্দ তাঁর উপন্যাসে এই দুই বদলের ভিতরকার প্রচ্ছায়া-প্রান্তর ('ওভারল্যাপিং জোন')-টিকে শনাক্ত করলেন অভ্রান্তভাবে। এখানেই ঔপন্যাসিক জীবনানন্দের আধুনিকতা।

গ) উপন্যাসের চরিত্র : মনোবিশ্লেষণের আলোকে

উপন্যাসের অন্যতম প্রধান উপাদান চরিত্র। চরিত্রের গড়ে ওঠার মধ্য দিয়েই নির্মিত হয় উপন্যাস নিজেও। জীবনানন্দের উপন্যাসে অসংখ্য চরিত্রের গতিশীলতার নিয়মে স্পষ্টতর হতে থাকে কতগুলি চরিত্রলক্ষণ, যুগবিচারের প্রেক্ষিতে যেগুলির মূল্য অপরিসীম। এইসব উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলি জীবনের উপরিতলের সফলতার বদলে একটি সপ্রশ্ন নেতিবাদের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। এই বোধ তাদের দাম্পত্য-সম্পর্কগুলিকে ভিন্নমাত্রিক করেছে। 'পূর্ণিমা' উপন্যাসে পূর্ণিমাকে তার "আশা-ভরসা ও স্বপ্নের ভুলের ভিতরেই রেখে দেবার প্রয়োজন বোধ" ('পূর্ণিমা'-১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ) করেছে সন্তোষ। তার মনে হয়েছে দাম্পত্যজীবনে "অশ্রুমমতাই সত্য"। কল্যাণী-হেমও পরস্পরকে সম্পূর্ণ নাকচ করেনি ('কারুবাসনা'-১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ)। কিন্তু আড়চোখ-দৃষ্টির সময় যত সমাসন্ন হয়, মানবসম্পর্কের সংযোগসূত্রটি ততই শিথিল হতে থাকে। প্রভাত ও কমলা ('নিরুপম যাত্রা'-১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ), অঞ্জলি ও শচীন ('জীবন প্রণালী'-১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ)-এর দাম্পত্য বাণিজ্যবুদ্ধিতে ও স্বার্থান্ধতায় রক্তাক্ত হয়। দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসগুলিতে দাম্পত্যের এই সংকট প্রকটতর হয়েছে। মাল্যবান ও উৎপলার ('মাল্যবান'-১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ) মধ্যে তাই আজ এক-পৃথিবী অনপনেয় ব্যবধান।

বিবাহ-সম্পর্কের প্রাতিষ্ঠানিকতার বাইরে নারী-পুরুষের অপ্রথাগত সম্পর্কগুলি বরং জীবনানন্দের উপন্যাসে সপ্রাণতায় জাগরূক। এর উদাহরণ—বনলতা-হেম, মণিকা-সুতীর্থ, বনচ্ছবি-সিদ্ধার্থ-রমা ইত্যাদি। উৎপলা, অঞ্জলিদের হিসেবি চলাচলের ভিড়ে আলাদা করে চোখে পড়ে বিভা, মৃণালের মত বৈপরীত্যও। 'মৃণাল' (১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ) উপন্যাসের ক্ষুদ্রায়তনিক শরীর ও হাতেগোনা

কিছু চরিত্রের আলাপে উপ্ত হয় এমন বৃহৎ এক প্রাণশক্তির বীজ, জড়িমা যাকে গ্রাস করতে অক্ষম।

বিরূপাক্ষ থেকে ওয়াজেদ আলী, প্রফেসর ঘোষ থেকে কুলদাপ্রসাদ, সুরেশবাবু থেকে নরেন-বরেন—যুদ্ধের বাজারে 'অনির্বচনীয় হুন্ডি'র ('১৯৪৬-৪৭') অধিকারমদমত্ত কৃকলাসদের চিত্রলিপি বিশ্বাস্যভাবে উদ্ধার করেছেন ঔপন্যাসিক জীবনানন্দ। জীবনানন্দের উপন্যাসগুলিতে অধিকাংশ সময়েই বয়স্ক বাবারা তার একাকী সন্তানদের মনের পরম দোসর (ব্যতিক্রম 'কল্যাণী'র পঙ্কজবাবু)। পরাজয়ের গ্লানি তাদের নেই, নেই জয়ের রাক্ষুসে খিদেও। জীবনানন্দের উপন্যাসে শৈশব সর্বত্রই কীটদষ্ট। 'নষ্ট শশা---পচা চালকুমড়ার' ('বোধ') প্রেক্ষাপটে তাই তো স্বাভাবিক। প্রকৃতিচেতনা আখ্যান-কথক জীবনানন্দেরও একটি প্রকৃত বাহন। সেখানে বাস্তু-প্রকৃতির অকৃপণ আয়োজন প্রকৃতিকে শুধু পট বলেই চিনতে শেখায় না। বরং, প্রকৃতি সেখানে স্বয়ং একটি চরিত্র।

<u>পঞ্চম অধ্যায় :</u>

<u>উপন্যাসের আঙ্গিকে প্রতিবিম্বিত সময় ও ব্যক্তিমন</u>

উপন্যাস কাকে বলে, এ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর সাহিত্যের সমালোচকেরা যুগ যুগ ধরে খোঁজার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু যে কোন সাহিত্য-আঙ্গিককে, আরও ব্যাপকভাবে বললে শিল্প-আঙ্গিককে, সর্বার্থে পূর্ণ সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করা বেশ দুরূহ কাজ। উপন্যাসের সংজ্ঞা দেওয়াও যে কঠিন তার প্রমাণ, বহু সমালোচক বহুবার এ কাজে হাত লাগালেও, আরও পূর্ণতর প্রয়াসের প্রয়োজন অচিরেই দেখা গিয়েছে। উপন্যাস কাকে বলে, সে সম্পর্কে একটি যথাসাধ্য ধারণা এই অধ্যায়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। পাশাপাশি 'কবি' জীবনানন্দের গদ্য আখ্যানগুলিকে প্রকৃত অর্থে উপন্যাস বলা যায় কিনা, তাঁর উপন্যাস রচনার কৌশল এখানে আলোচিত হয়েছে। উপন্যাসের আঙ্গিক নিয়ে আলোচনার জন্য জীবনানন্দের প্লট নির্মাণ কৌশল, চরিত্র সৃষ্টি, সংলাপ রচনা ও ভাষাব্যবহারের দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। উপন্যাসের আঙ্গিক নিরীক্ষার প্রচলিত পদ্ধতিগুলিকে তিনি ছাপিয়ে গিয়েছিলেন কীভাবে, সে দিকে নজর রাখা হয়েছে। ডায়েরিধর্মিতা, গদ্য-পদ্যের বেড়াভাঙা ভাষা, চিত্রধর্ম কীভাবে তাঁর উপন্যাসকে প্রাঞ্জল করেছে তা খুঁজে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে, ঔপন্যাসিক জীবনানন্দের সৃষ্টিতে বিশ শতকের প্রথমার্ধের নতুন সময়টা কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, আঙ্গিকগত দিক থেকে তাও আমরা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি।

ষষ্ঠ অধ্যায় :
উপন্যাসে কবিসত্তার ছায়াপাত

রবীন্দ্রপরবর্তী বাংলা কবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা জীবনানন্দের কবিসত্তার ছায়া তাঁর উপন্যাসেও পড়েছে। 'কারুবাসনা' ও 'মাল্যবান'-এর মতো দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাসের সমাপ্তিলগ্নে শুনতে পাই, দুটি কবিতার স্বগত উচ্চারণ। উপন্যাসগুলির ভাষার কাব্যগুণ সম্পর্কে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে যে বনলতা সেনের সঙ্গে বাঙালি কাব্যপাঠকের পরিচয় ঘটেছে, অন্তত তার একদশক আগেই ঔপন্যাসিক জীবনানন্দ 'কারুবাসনা'তে সেই বনলতাকে অবগুণ্ঠনমুক্ত করেছেন।

তবু, এসবই বাহ্য কিছু তথ্যাবলী। 'ঝরাপালক' থেকে 'বেলা অবেলা কালবেলা'র পথে কবি জীবনানন্দের বক্তব্য যেভাবে একটি পরিণতি পেয়েছে, তারই সমান্তরালে 'বিভা', 'মৃণাল', 'কারুবাসনা'র স্রষ্টা 'জলপাইহাটি'র পথে গমনাগমন করেছেন। তাই জীবনানন্দের উপন্যাসে তাঁর কাব্যলক্ষণ রেখাপাত করেছে তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়েই। জীবনানন্দের উপন্যাসে তাঁর কবিসত্তার প্রভাব, এই দুইয়ের যোগসূত্র ও এদের মধ্যবর্তী সম্পর্কের সন্ধান করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

সপ্তম অধ্যায় :
উত্তরকালে জীবনানন্দের উপন্যাসের প্রাসঙ্গিকতা

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে, ঔপন্যাসিক জীবনানন্দ এ-পর্যন্ত বহুপঠিত নন। তিনি নিজেই অবশ্য তাঁর উপন্যাসকে পাঠকের সামনে আনেননি। অথচ তাঁর উপন্যাসের পরিমাণ নেহাৎ কম নয়। বিশ্বযুদ্ধের বাতাবরণে নগরজীবনে যে জটিলতার সূত্রপাত, বিশ্বায়িত পুঁজিবাদের হাত ধরে সেই জটিলতা আজ আরও ভয়াবহভাবে সুদূরপ্রসারী। সেই জটের চরিত্রকে উপলব্ধি করবার সৎ প্রয়াস জীবনানন্দের উপন্যাসে আছে। যন্ত্রবিজ্ঞানের রথচক্রের ক্ষিপ্রতম গতি জন্ম দিচ্ছে যন্ত্রসর্বস্বতার। কেননা মানুষই কেবল যন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করেনা, মানুষের মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠছে যন্ত্রও। এই যন্ত্রণা যত অসহনীয় হয়ে উঠছে, ততই প্রয়োজন বাড়ছে জীবনানন্দের সংবেদী উপন্যাসগুলির। তাছাড়া কবির হাতে লেখা মরমী গদ্যের উৎসারও ঘটেছে এই উপন্যাসগুলিতে। পরবর্তীকালে জয় গোস্বামীর 'সাঁঝবাতির রূপকথারা' উপন্যাসটি এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সর্বোপরি যে বক্তব্য জীবনানন্দের উপন্যাসে ভাষা পেয়েছে তা তাঁর খাঁটি জীবনবিশ্বাস। সেখানে উপন্যাসপাঠের তথাকথিত আরাম নেই। জীবনানন্দের উপন্যাস পাঠ করা আয়াসসাধ্য। আমাদের মনে হয়, জটিলতর ও গভীরতর অসুখের যে সময়-সরণী বেয়ে আজ মানবসভ্যতাকে চলতে হচ্ছে, তাতে ভবিষ্যতের পাঠক-পাঠিকা নতুনভাবে ঔপন্যাসিক জীবনানন্দকে আবিষ্কার করবেন।

উপসংহার

কবিতার অস্থিতে ইতিহাস তথা সময়চেতনার বোধের উপস্থিতির কথা জীবনানন্দ বলেছেন। তাঁর উপন্যাসের যে ভুবন ঔপন্যাসিকের জীবৎকালে প্রকাশিত হয়নি; তারও অস্থি, সময়ের বাচন দিয়েই নির্মিত। ভাঙাগড়ার সেই সন্ধিক্ষণে সংবেদনশীল মানুষ কীভাবে বিপন্ন হয়েছে, আবার সংকট থেকেই কীভাবে সে খুঁজে নিতে চেয়েছে অন্য এক যাপনের পরিসরকে, সে দিকে ইঙ্গিত করেছেন ঔপন্যাসিক জীবনানন্দ। তাঁর উপন্যাস কেন আজও পাঠকের আম-দরবারে সম্পূর্ণভাবে পৌঁছে যায়নি সে কথা গভীরভাবে ভাববার। আবার এও লক্ষণীয় যে তাঁর নতুন নতুন উপন্যাস আজ প্রকাশ পাচ্ছে। জীবনানন্দের উপন্যাস সম্পর্কে পাঠক সমাজের একটি অংশের গভীর আগ্রহ এখন লক্ষ করা যাচ্ছে। এই গবেষণায় জীবনানন্দের উপন্যাসের সেই সীমাবদ্ধতা ও সক্ষমতার কয়েকটি দিককে চিহ্নিত করে বিশ্লেষণাত্মক মূল্যায়নের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। তারই মধ্যে দিয়ে সময়ের আত্মাকে ছুঁয়ে থাকা ঔপন্যাসিকের গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং তাঁর লেখনীর মৌলিকতা সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা গড়ে তুলতে চেয়েছি আমরা।

উল্লেখপঞ্জি

১. মহাশ্বেতা দেবী, "ভূমিকা", 'মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সংকলন' (শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত), ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, নয়াদিল্লি, প্রথম সংস্করণ, সপ্তম পুনর্মুদ্রণ, ২০১১, পৃষ্ঠা- vii

২. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, "আলোচ্য কালসীমা ও পটভূমি", 'দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাঙলা কথাসাহিত্য', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুন ২০০০, পৃষ্ঠা- ১৫

৩. https://bn.m.wikipedia.org>wiki>বঙ্গভঙ্গ(১৯০৫)

৪. হরিশংকর জলদাস, "১৯০৫ । বয়স ৬ বছর", 'জীবনানন্দ ও তাঁর কাল', অবসর, ঢাকা, পরিবর্ধিত প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা- ২১-২২

৫. সুমিত সরকার, "১৯৪২-১৯৪৫ : ভারত ছাড়ো আন্দোলন, দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধের শেষ পর্যায়", 'আধুনিক ভারত ১৮৮৫-১৯৪৭', কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৩৫০

৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৭৩

৭. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, "তিরিশের যুগ : বাংলা উপন্যাসের দ্বিধামুক্তি", 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর', পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৮৮, পৃষ্ঠা- ২৯৪

৮. সুমিতা চক্রবর্তী, "জীবনানন্দ ও তাঁর প্রবন্ধ", 'জীবনানন্দ : সমাজ ও সমকাল', সাহিত্যলোক, কলকাতা, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ২০০১, পৃষ্ঠা- ১১৮

৯. জীবনানন্দ দাশ, "The Bengali Novel Today", 'সমগ্র প্রবন্ধ' (ভূমেন্দ্র গুহ সম্পাদিত), প্রতিক্ষণ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৯, পৃষ্ঠা- ১৬২

১০. সুমিতা চক্রবর্তী, "জীবনানন্দ এবং তাঁর গল্প-উপন্যাস", 'জীবনানন্দ : সমাজ ও সমকাল', সাহিত্যলোক, কলকাতা, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ২০০১, পৃষ্ঠা- ৪৩

১১. গৌতম মিত্র, "জীবনানন্দ দাশের ডায়েরি : এক অপব্যয়ী অক্লান্ত আগুন", 'এইসময় সংবাদপত্র শারদীয়া ১৪২২' (সম্পা: সুমন চট্টোপাধ্যায়), এইসময়, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ৪১

১২. জীবনানন্দ দাশ, "ভূমিকা", 'জীবনানন্দ দাশের উপন্যাসসমগ্র' (দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত), গতিধারা, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, ২০০০, পৃষ্ঠা- ৭

১৩. শঙ্খ ঘোষ, "৯ই জানুয়ারি, সকাল", 'শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পরিবর্ধিত সপ্তম সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৯৬, পৃষ্ঠা- ১১

১৪. জীবনানন্দ দাশ, "সুতীর্থ", 'জীবনানন্দ দাশের উপন্যাসসমগ্র' (দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত), গতিধারা, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, ২০০০, পৃষ্ঠা- ৭৫৪

১৫. শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, "জীবনানন্দের কলকাতা যাত্রা", 'প্রসঙ্গ : জীবনানন্দ', গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা- ১৪৫

১৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৪৫

গ্রন্থতালিকা ও পত্রিকা-তালিকা

আকর গ্রন্থ

১. জীবনানন্দ দাশ, 'অপ্রকাশিত শেষ ১৪টি গল্প ও ২টি উপন্যাস' (ভূমেন্দ্র গুহ সম্পাদিত), প্রতিক্ষণ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১২

২. জীবনানন্দ দাশ, 'আলোপৃথিবী', নিউ স্ক্রিপ্ট, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৫

৩. জীবনানন্দ দাশ, ‘চারটি উপন্যাস’ (ভূমেন্দ্র গুহ সম্পাদিত), প্রতিক্ষণ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৬
৪. জীবনানন্দ দাশ, ‘ছায়া আবছায়া’ (ভূমেন্দ্র গুহ, গৌতম মিত্র সম্পাদিত), প্রতিক্ষণ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৪
৫. জীবনানন্দ দাশ, ‘জীবনানন্দ দাশের উপন্যাসসমগ্র’ (দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত), গতিধারা, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, ২০০০
৬. জীবনানন্দ দাশ, ‘জীবনানন্দ দাশের গল্পসমগ্র’ (দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত), গতিধারা, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, ২০০০
৭. জীবনানন্দ দাশ, ‘জীবনানন্দ সমগ্র’ (জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, উপন্যাস ১, দেবেশ রায় সম্পাদিত), প্রতিক্ষণ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৩
৮. জীবনানন্দ দাশ, ‘জলপাইহাটি’ (জীবনানন্দ সমগ্র, চতুর্থ খণ্ড, দেবেশ রায় সম্পাদিত), প্রতিক্ষণ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৮৫
৯. জীবনানন্দ দাশ, ‘ঝরা পালক’, নিউ স্ক্রিপ্ট, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, নভেম্বর ২০১২
১০. জীবনানন্দ দাশ, ‘দিনলিপি’ (উদ্ধার ও বিশ্লেষণ- ভূমেন্দ্র গুহ), প্রতিক্ষণ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০০৯, খণ্ড - ১
১১. জীবনানন্দ দাশ, ‘দিনলিপি’ (উদ্ধার ও বিশ্লেষণ- ভূমেন্দ্র গুহ), প্রতিক্ষণ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০০৯, খণ্ড - ২
১২. জীবনানন্দ দাশ, ‘প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র’ (আবদুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত), অবসর, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, চতুর্থ পুনর্মুদ্রণ, মার্চ ২০০৫
১৩. জীবনানন্দ দাশ, ‘প্রথম প্রকাশিত গল্প’, গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম গাঙচিল সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১২
১৪. জীবনানন্দ দাশ, ‘বাসমতির উপাখ্যান’ (জীবনানন্দ সমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, দেবেশ রায় সম্পাদিত), প্রতিক্ষণ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৩৯৫
১৫. জীবনানন্দ দাশ, ‘বেলা অবেলা কালবেলা’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, জুন ১৯৮৮
১৬. জীবনানন্দ দাশ, ‘বনলতা সেন’, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, সপ্তবিংশ সংস্করণ, পৌষ ১৪০৮
১৭. জীবনানন্দ দাশ, ‘মহাপৃথিবী’, নিউ স্ক্রিপ্ট, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, নভেম্বর ২০১২
১৮. জীবনানন্দ দাশ, ‘মহাপৃথিবী’, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, নবপর্যায় সিগনেট প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৫

১৯. জীবনানন্দ দাশ, 'রূপসী বাংলা' (প্রকাশিত-অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি ও পাঠান্তর সংস্করণ, দেবেশ রায় সম্পাদিত), প্রতিক্ষণ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, চতুর্থ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০০৯
২০. জীবনানন্দ দাশ, 'সফলতা নিষ্ফলতা' (ভূমেন্দ্র গুহ সম্পাদিত), প্রতিক্ষণ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০০৪
২১. জীবনানন্দ দাশ, 'সমগ্র প্রবন্ধ' (ভূমেন্দ্র গুহ সম্পাদিত), প্রতিক্ষণ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৯
২২. জীবনানন্দ দাশ, 'সুতীর্থ', নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০১
২৩. জীবনানন্দ দাশ, 'হে প্রেম, তোমারে ভেবে ভেবে', প্রতিক্ষণ, কলকাতা, শোভন সংস্করণ, নভেম্বর ২০১৪

সহায়ক গ্রন্থ

জীবনানন্দ-বিষয়ক মৌলিক আলোচনা-গ্রন্থ

২৪. অম্বুজ বসু, 'একটি নক্ষত্র আসে', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, চতুর্থ পরিমার্জিত সংস্করণ, ২০০৪
২৫. অমলেন্দু বসু, 'জীবনানন্দ', বাণীশিল্প, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুন ২০০৬
২৬. অরিন্দম চক্রবর্তী, 'দেহ গেহ বন্ধুত্ব : ছটি শারীরক তর্ক', অনুষ্টুপ, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, জুন ২০১১
২৭. অরুণেশ ঘোষ, 'জীবনানন্দ', কবিতীর্থ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮
২৮. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, 'জীবনানন্দ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম দে'জ সংস্করণ, জুলাই ২০০৭
২৯. কল্যাণকুমার বসু, 'বিকেলের নক্ষত্রের কাছে', কল্যাণকুমার বসু প্রকাশিত, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৯৮
৩০. কেতকী কুশারী ডাইসন, 'তিসিডোর', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, চতুর্থ মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১১
৩১. গোপালচন্দ্র রায়, 'জীবনানন্দ', পারুল প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১৫
৩২. জহর সেন মজুমদার, 'জীবনানন্দ ও অন্ধকারের চিত্রনাট্য', মডেল পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৯৮
৩৩. জয় গোস্বামী, 'নিজের জীবনানন্দ', প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১০

৩৪. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘জীবনানন্দ দাশ : বিকাশ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম দে’জ সংস্করণ, জুলাই ২০০৭
৩৫. পূর্ণেন্দু পত্রী, ‘রূপসী বাংলার দুই কবি’, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, নভেম্বর ১৯৮০
৩৬. প্রদ্যুম্ন মিত্র, ‘জীবনানন্দের চেতনাজগৎ’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, অক্টোবর ২০১১
৩৭. প্রভাতকুমার দাশ, ‘জীবনানন্দ দাশ’, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯
৩৮. বিনয় মজুমদার, ‘ধূসর জীবনানন্দ’, কবিতীর্থ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, মার্চ ২০০৭
৩৯. ভূমেন্দ্র গুহ, ‘জীবনানন্দ সঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং’, সৃষ্টি প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০১
৪০. ভূমেন্দ্র গুহ, ‘আলেখ্য : জীবনানন্দ’, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০০৭
৪১. মনোজ চাকলাদার, ‘আধুনিক ঔপন্যাসিক জীবনানন্দ দাশ’, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬
৪২. লাবণ্য দাশ, ‘মানুষ জীবনানন্দ’, ভাষাচিত্র, ঢাকা, প্রথম ভাষাচিত্র সংস্করণ, একুশে বইমেলা, ২০১২
৪৩. শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘প্রসঙ্গ : জীবনানন্দ’, গাঙচিল, কলকাতা, দ্বিতীয় সংশোধিত সংস্করণ, অগস্ট ২০১৫
৪৪. সঞ্জয় ভট্টাচার্য, ‘কবি জীবনানন্দ দাশ’, ভারবি, কলকাতা, পরিমার্জিত সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৪
৪৫. সুব্রত বড়ুয়া, ‘গল্পে গল্পে জীবনানন্দ দাশ’, পাঞ্জেরী পাবলিকেশনস, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০১০
৪৬. সুমিতা চক্রবর্তী, ‘জীবনানন্দ : সমাজ ও সমকাল’, সাহিত্যলোক, কলকাতা, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ২০০১
৪৭. সুরজিৎ দাশগুপ্ত, ‘স্মৃতির দর্পণে তিন কবি : জীবনানন্দ, সুধীন্দ্র, সুভাষ’, সাহিত্য প্রকাশ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১০
৪৮. স্বাতী গুহ, ‘জীবনানন্দের উপন্যাস : মেটাফর ব্যবহার’, রেনেসাঁস পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৭

জীবনানন্দ-বিষয়ক সম্পাদিত গ্রন্থ

৪৯. অসীমকৃষ্ণ দত্ত সম্পাদিত, ‘প্রসঙ্গ জীবনানন্দ’, কবিকণ্ঠ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০১

৫০. উজ্জ্বলকুমার দাস সম্পাদিত, ‘জীবনানন্দ স্মৃতি’, সাহিত্যম, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি, ২০০০

৫১. ডঃ রমেন্দ্রনারায়ণ নাগ সম্পাদিত, ‘বিশেষ কিছুই চাই না : জীবনানন্দের কথাসাহিত্য প্রবন্ধসংকলন’, ডঃ রমেন্দ্রনারায়ণ নাগ প্রকাশিত, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯

৫২. তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, ‘একদিন শতাব্দীর শেষে : জীবনানন্দ স্মারক সংকলন’, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মার্চ ২০০০

৫৩. বিশ্বজিৎ ঘোষ, মিজান রহমান সংকলিত ও সম্পাদিত, ‘জীবনানন্দ দাশ : জীবন ও সাহিত্য’, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৩

৫৪. ভূমেন্দ্র গুহ সম্পাদিত, ‘জন্মশতবর্ষে জীবনানন্দ’, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি, প্রথম সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১৩

৫৫. শঙ্খ ঘোষ সম্পাদিত, ‘এই সময় ও জীবনানন্দ’, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি, প্রথম সংস্করণ, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০১৩

৫৬. সন্দীপ দত্ত সম্পাদিত, ‘জীবনানন্দ প্রাসঙ্গিকী’, হার্দ্য, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪

সহায়ক পত্র-পত্রিকা

৫৭. জগদীন্দ্র মণ্ডল, সমীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, ‘জীবনানন্দ স্মৃতি ময়ুখ’, কলকাতা, পৌষ- জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১-৬২

৫৮. তাপস ভৌমিক সম্পাদিত, ‘জীবনানন্দ কোরক সংকলন’, কোরক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৬

৫৯. তারাপদ ঘোষ, অজিত মণ্ডল সম্পাদিত, ‘পশ্চিমবঙ্গ’ (কবি জীবনানন্দ দাশ স্মরণ সংখ্যা), তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ১৪০৭

৬০. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ‘অনুষ্টুপ’ (জীবনানন্দ বিশেষ সংখ্যা), অনুষ্টুপ, কলকাতা, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৯৯

৬১. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ‘জীবনানন্দ ও আমরা’, অনুষ্টুপ, কলকাতা, অক্টোবর ১৯৯৯
৬২. পল্লব সেনগুপ্ত সম্পাদিত, ‘বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা’ (জীবনানন্দ দাশ জন্মশতবর্ষ স্মারক সংখ্যা), রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০০
৬৩. ভূমেন্দ্র গুহ সম্পাদিত, ‘বিভাব’ (জীবনানন্দ দাশ জন্মশতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা), বিভাব, কলকাতা, ১৯৯৮
৬৪. শেখর বসু রায় সম্পাদিত, ‘বৈদগ্ধ্য’ (জীবনানন্দ দাশ সংখ্যা), কলকাতা, ১৯৯৯
৬৫. সন্দীপ দত্ত সম্পাদিত, ‘উজ্জ্বল উদ্ধার’ (২৫), কলকাতা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৮
৬৬. সৌমিত্র লাহিড়ী সম্পাদিত, ‘যুবমানস’ (জীবনানন্দ সংখ্যা), কলকাতা, জুলাই ১৯৯৯